সংবাদ পরিষেবা | ডিসেম্বর ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রাজ্যের ১৪টি জেলা

২৯/৩৮

ন্যাশনাল ইনোভেশনস অন ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট এগ্রিকালচার (নিক্রা), দেশের মোট ৩১০টি জেলাকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ১০৯টি জেলা চরম ঝুঁকিপূর্ণ আর ২১০টি অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য, জলবায়ু সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছে। ২০১৪ সাল থেকে এযাবৎ তারা ১৯৭১ টি জলবায়ু সহনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে।

এর প্রসারের জন্য, একদিকে তারা যেমন ফসল সরবরাহ করছে। অন্যদিকে গ্রাম পর্যায়ের জল সম্পদ বৃদ্ধি এবং তার ব্যবস্থাপনার জন্য সামূহিক বা কমিউনিটি ট্যাঙ্ক/পুকুরের সংস্কার; জল ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করা; জমি সমতল করার কাজ; মাটি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা; ফসলের নার্সারি; আকস্মিক বিপর্যয়ের পর ফসল পরিকল্পনা; ধানের ফলনে টেকসই কৃষির প্রসার এবং হাল না চষে ধানের চাষ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কৃষিকাজে ছোটখাট যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য কাস্টম হায়ারিং সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বীজ ধান সরবরাহ, জমিতেই ফসলের অবশিষ্টাংশ ব্যবহার, কৃষি বনায়ন এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষির জন্য সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রসার করা হচ্ছে।

নিক্রার মতে, পশ্চিমবঙ্গের চরম ঝুঁকিপূর্ণ জেলা হল, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আর অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলি হল, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, পুরুলিয়া, হাওড়া ও মেদিনীপুর।

মাটি মা মানুষ

২৯/৩৯

পৃথিবীতে সব থেকে বেশি যে সম্পদ রয়েছে সেটি হল মাটি। মাটি জীবনকে টিকিয়ে রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মাটির সংরক্ষণে বরাবরই খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মাটি আসলে জৈব পদার্থ, খনিজ পদার্থ, গ্যাস, তরল এবং জীবন্ত প্রাণীর সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল মিথস্ক্রিয় ব্যবস্থা। এই জটিল ব্যবস্থা সব জীবের প্রাণের সংরক্ষক। এর মধ্যে থাকা জৈব উপাদান, যেমন হিউমাস এবং অণুজীব, মাটিকে বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রাণবন্ত এবং অপরিহার্য উপাদানে রূপান্তরিত করে।

মাটি হল জীবনের ভিত্তি, খাদ্য উৎপাদন, জল পরিশোধন, বন্যা সুরক্ষা, খরা প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজনীয় খনিজ সরবরাহ করে। একই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন গ্রহণ করে জলবায়ু বদল প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

সুস্থ মাটি ছাড়া, বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদান, খাদ্য উৎপাদনই ব্যাহত হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, গত ৪৫ থেকে ৬০ বছরে, মাত্র ৮০ থেকে ১০০টি 'আধুনিক' ফসলের ওপর নির্ভর হয়ে, আমরা মাটির ব্যবহারকে সীমিত করে দিয়েছি। ফলে বেশিরভাগ মানুষের খাদ্য স্বয়ম্ভরতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

খুব জরুরি কথা হল, জলবায়ু বদল প্রশমিত করতে, স্বাস্থ্যকর মাটি খুবই দরকার। কিন্তু বর্তমান চাষ ব্যবস্থা এবং বনধ্বংসের জন্য মাটির ক্ষয় উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী ৫২ শতাংশ কৃষি জমি ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে গেছে।

প্রতি বছরে ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মাটি দিবস পালন করা হয়। এ বছরও খুব ধুমধাম করে তা পালন হয়েছে। কিন্তু বলেই দেওয়া যায়, মাটি অবহেলিত থেকেই যাবে। যদি না আমাদের চলতি চাষ ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়।

মনে রাখা দরকার, মাটি এবং জল একসঙ্গে আমাদের খাদ্য সরবরাহের ৯৫ ভাগ সরবরাহ করে। আমাদের কৃষি ব্যবস্থার মেরুদণ্ডই হল মাটি। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি জৈব এবং টেকসই কৃষির পক্ষে কথা বলছে। রাসায়নিক মুক্ত মাটি, মাটির জৈব পদার্থ সংরক্ষণ, মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা, ভূজলের ক্ষতি কমানো এবং মাটির ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কাজ চলছে। কিন্তু যে তৎপরতার সঙ্গে এই কাজ করা দরকার তা হচ্ছে না। আমরা কারণের বদলে ফলাফলের চিকিৎসা করছি। তাই এর ক্ষয় রোধ করা ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়ছে।

বাড়ছে খেতমজুরদের আত্মহত্যা

২৯/৪০

সম্প্রতি প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবি-এর তথ্য অনুসারে, গত ১ বছরে সারা দেশে ১১,২৯০ জন চাষি এবং কৃষিকাজে যুক্ত মানুষ আত্মহত্যা করেছে। এটা ২০২০ এবং ২০২১ এর তুলনায় যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ এবং ৩.৭ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২-এর পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে প্রতি ঘন্টায় অন্তত একজন চাষি আত্মহত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৯ সাল থেকে চাষিদের আত্মহত্যা ক্রমশ বাড়ছে।

এনসিআরবি রিপোর্টে দেখা যাছে, সব থেকে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। তারপর রয়েছে কর্নাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, লাক্ষাদ্বীপ, এবং পুদুচেরির মতো কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চাষি এবং খেতমজুরদের আত্মহত্যার ঘটনা শূন্য দেখানো হয়েছে। এ নিয়ে তাই বিতর্কও দেখা দিয়েছে।

এনসিআরবি-এর রিপোর্টে আরো উদ্বেগজনক যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা হল, খেতমজুরদের আত্মহত্যার তথ্য । খেতমজুররা সাধারণত, দৈনিক মজুরির ওপর নির্ভর করে। কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষদের মোট আত্মহত্যার মধ্যে ৫৩ শতাংশই হল খেতমজুর। এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বেশ কিছু বছর ধরে, কৃষি পরিবারগুলির গড় আয় ফসল উৎপাদনের থেকে খেতমজুরি করে বেশি হচ্ছে।

২০১১ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে, ল্যান্ড অ্যান্ড লাইভস্টক হোল্ডিংস অফ হাউসহোল্ডস এবং সিচুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট অফ অ্যাগ্রিকালচার হোল্ডস-এর ৭৭তম রাউন্ডের সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছিল। সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল, একটি চাষি পরিবার সব থেকে বেশি আয় করছে মজুরি থেকে। এরপর ছিল পশুপালন। তারপর চাষ। ২০১৩ সালের পর থেকে, ফসল উৎপাদন থেকে চাষি পরিবারের আয় ধারাবাহিকভাবে কমছে।

খাদ্য স্বয়ম্ভরতা

২৯/৪১

সুব্রত কুণ্ডু

দুর্গা একজন চাষি। তার ২ ছেলে ও মেয়ে। থাকে বারুইপুরের কাছে বৈকুন্ঠপুর গ্রামে। পরিবারে সে একমাত্র আয় করে। তার ২ বিঘা চাষের আর পুকুর নিয়ে এক বিঘা বাস্তু জমি। এই জমিতে সে সারা বছর সবজি ও ধান চাষ করে। আগে সে ও তার বর রাসায়নিক সার, বিষ দিয়েই চাষ করত। ২০২০ সালে কোভিডের সময়, দেনার দায়ে, চাষের জন্য রাখা বিষ থেকে তার বর আত্মহত্যা করে। এখন দুর্গা তার জমিতে রাসায়নিক সার বিষ ছাড়া, জৈব উপায়ে চাষ করে। বালিগঞ্জ রেলস্টেশনের পাশে, জৈব

ফসল বিক্রির একটি দোকান আছে। মহাজনের থেকে একটু বেশি দামের আশায়, সে সপ্তাহে ৪ দিন এই দোকানে তার উৎপাদন করা শাক সবজি দেয়। এই আয়ে তার সংসার চলে।

জৈব উপায়ে চাষের জন্য এখন তাকে জল, মাটি, বীজ ইত্যাদি সম্পদের টেকসই ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হয়। নজর রাখতে হয় তার জমির ইকো সিস্টেম বা বাস্তু ব্যবস্থার ওপর। পাশাপাশি আয় যাতে সবথেকে বেশি হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। পড়াশোনার সাথে তার ছেলে ও মেয়ে চাষের কাজে সাহায্য করে। এইভাবে তারা জৈব চাষের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় শিখে গেছে।

অভিষেক একজন যুবক। তার বাড়ি শিলিগুড়ি শহরে। চাকরি সূত্রে সে কলকাতার একডালিয়া পার্কে থাকে। সে খুব সহজেই তার খাবার জোগাড় করতে পারে। সে যেমন স্থানীয় বাজার, জৈব ফসলের দোকান, ঝাঁ চকচকে মল থেকে খাবার কেনে। আবার তৈরি খাবার বিভিন্ন দোকান, রেস্তোরাঁ থেকে আনিয়েও নেয়। কখনো বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় গিয়ে খায়। অভিষেক এবং তার মত অনেক শহুরে মানুষ, দরকারের থেকে অনেক বেশি খাবার কেনে। তাই খাবারের অপচয়ও হয়।

তবে দুর্গা আর অভিষেক দুজনেই বিশ্বজুড়ে চলা কৃষি শিল্প এবং তার থেকে তৈরি খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে। তারা জানে এই ব্যবস্থা টেকসই নয়— মানে বেশি দিন টিকবে না। এই চাষ ও খাদ্য ব্যবস্থার ফলে জলবায়ু বদল হচ্ছে। মাটি, জল হাওয়া দূষিত হচ্ছে। জীববৈচিত্র কমে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষের খাবারের অভাব হচ্ছে। আর গ্রামীণ জীবনেও প্রচুর চাপ তৈরি হচ্ছে।

বহুক্ষেত্রে চাষি এবং গ্রামীণ উৎপাদকরা, তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম পাচ্ছে না। তাই অল্প বয়সীরা চাষ করতে চাইছে না। আর চাষি এবং কারিগরেরা তাদের কাজ ছেড়ে মজুরে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য ব্যবসায়ী বড় বড় কোম্পানিগুলির প্রচুর মুনাফা বাড়ছে। অনেক জায়গায় চাষিদের উর্বর জমি জোর করে দখল নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কৃষিশিল্প ও খাদ্য ব্যবসার জন্য। বেঁচে থাকার তাগিদে এই শিল্প এবং ব্যবসায় যে মজুরেরা যুক্ত হচ্ছে, তাদের মানবাধিকার বলে কিছু থাকছে না। দাসে পরিণত হচ্ছে তারা।

বিশ্বের বিরাট সংখ্যক মানুষের খাবারের অভাব হলেও, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাদ্য সামগ্রী বাজার ছেয়ে ফেলছে। তবে এইসব খাবারের বেশিরভাগটাই প্রক্রিয়াজাত এবং তাদের গুণমান বেশ খারাপ। ফলে খাবারের সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্যের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠছে। নতুন নতুন রোগ ব্যাধি জাঁকিয়ে বসছে। সতেজ, উপযুক্ত, মরশুমি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাবার পাওয়া এখন বেশ দুষ্কর।

দুর্গা এবং অভিষেকের মত স্থানীয় মানুষেদের জন্য কীভাবে খাদ্য তৈরি হবে, কীভাবে ব্যবসা হবে এবং কীভাবে খাদ্য বন্টন ও ব্যবহার হবে— তার ওপর স্থানীয় মানুষদেরই নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। অধিকার থাকা উচিত জমি, জল, বীজ ইত্যাদি মূলভূত সম্পদের ওপর। অধিকার থাকা উচিত এ নিয়ে স্থানীয় নীতি, নিয়ম, পরিকল্পনা, প্রকল্প তৈরির। খাদ্যের ওপর এই অধিকারই হল খাদ্য স্বয়ম্ভরতা।

খাদ্য স্বয়ম্ভরতা মানুষ এবং পরিবেশের পক্ষে ভালো খাদ্য ব্যবস্থা তৈরিতে সহায়তা করে। কৃষি শিল্পের বদলে স্থানীয় প্রকৃতিমুখী চাষ ব্যবস্থা তৈরি, স্থানীয় এবং ন্যায় সঙ্গত ব্যবসা এবং এগুলি সম্পর্কীত নীতি-পদ্ধতি তৈরি করতে সাহায্য করে। যার থেকে মানুষ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকর খাবার পায়। প্রাকৃতিক দিক থেকে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হয়। এটা স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বাজার ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করে। উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়ই লাভবান হয়। দুর্গা এবং অভিষেকের মত সব মানুষই পর্যাপ্ত খাবার পাওয়ার অধিকারী হয়। তারা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকর, ভালো গুণমানের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং পছন্দ অনুযায়ী খাবার পায়।

মতামত নিজস্ব

সংবাদ পরিষেবা | ডিসেম্বর ২০২৩

কমলার খোসার গুণ

২৯/৪২

কমলা লেবু ও তার খোসা দুটোই পুষ্টিতে ভরপুর। তাই নিয়ম করে প্রতিদিন কমলা খাওয়া দরকার। শীতকালে বাজারে কমলার আমদানি বাড়ে। তাই পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা এই সময়ে বেশি বেশি কমলা খাওয়ার পরামর্শ দেন। কমলাকে বলা হয় শতগুণে সমৃদ্ধ ফল। কমলার খোসার নানা রকমের উপকারিতা রয়েছে।

শীতের দিনে কেক বা বিস্কুট যদি তৈরি করেন, তাহলে কমলার খোসা শুকিয়ে মিহি করে বেঁটে নিন। তা কেক বা বিস্কুট বানানোর জন্য প্রয়োজন। এটি স্যালাড বানানোর কাজে লাগাতে পারেন, গন্ধের জন্য। এছাড়াও কমলার খোসা দিয়ে জ্যামও তৈরি করা যায়।

মুখের ব্রণ সারাতে কমলার খোসা ব্যবহার করা যায়। প্রথমে একটি আস্ত কমলার খোসা জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। জল ঠাণ্ডা হলে তা মুখে মেখে নিন। এটি বেশ কয়েকদিন ধরে ফ্রিজে রেখে প্রতিদিন মুখে লাগাতে পারেন। এতে কয়েকদিন পর থেকে ত্বকের উজ্জলতা হবে দেখার মত।

দাঁতের হলুদ ভাব কাটাতে কমলার খোসায় জল ছিটিয়ে তা দাঁতে ভালো করে ঘসে নিন। এতে দাঁতের হলদে ভাব নিমেষে চলে যাবে। চাইলে খোসা বেটে তা টুথ ব্রাশে লাগিয়েও ব্যবহার করতে পারেন।

ঘরের গন্ধ দূর করতে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে সামান্য দারচিনি, কমলার খোসা দিয়ে কয়েক মিনিট ফুটিয়ে নিন। এই মিশ্রণের গন্ধে ঘরে থাকা শীতের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ চলে যাবে।

কমলার খোসা ত্বকের যত্নে খুবই ভালো একটি উপাদান। ত্বকে তেলের ভারসাম্য রক্ষায় কমলার খোসা বেশ উপকারী। কমলার খোসা ত্বকের যত্নে ব্যবহার করতে চাইলে, প্রথমে তা শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন। তারপর মুসুরের ডালের সঙ্গে তা বেটে নিয়ে মুখে লাগাতে হবে। এতে মুখের দাগ চলে যায়।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু